

বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার

এ,এম,এম, রেজা-ই-রাব্বী*

ভূমিকা

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দুর্নীতি একটি দুষ্ট সামাজিক ব্যাধি। মানব সভ্যতার আদি থেকে অদ্যাবধি এ ব্যাধির প্রকোপ ও প্রসার সমাজে চলে আসছে। প্রাচীন সভ্যতা সমূহ, সামন্ত সমাজ, শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবোত্তর ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সকল স্তরেই এর গতিবিধি ও ব্যাপ্তি কম নয়। বিভিন্ন যুগে পাক ভারত উপমহাদেশেও এর পত্তন ও প্রসার ঘটে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নিরূপন করতে গেলে দেখা যায় যে, এই ব্যাধির সর্বাধিক প্রবৃদ্ধির ও প্রসার ঘটে উপনিবেশিক শাসন আমলে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে প্রশাসনের সকল স্তর, ধনিক-বণিক শ্রেণীসহ সমাজের সুবিধা ভোগী উচ্চ স্তরে এর প্রসার ঘটে এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

বিভিন্ন যুগে ও সময়ে যে হারে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রসার হয়েছে তার এক ক্ষুদ্রাংশ পরিমাণও সমীক্ষা হয়নি এ সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয়, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপর। তাই এ ব্যাধির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন তথ্য নির্ভর দলিল পাওয়া কষ্টকর। তবে ঐতিহাসিকগণ সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনাকালে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ ও বর্ণনা রেখেছেন তা থেকে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে আগমন ও শক্তি সঞ্চয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও বিভিন্ন পর্যায়ে যে কুট-কৌশল ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল তা পাওয়া যায় তৎকালীন ইতিহাসে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নিরূপণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে। আর তাই পাক-ভারত উপ-মহাদেশের এবং বাংলাদেশের উপর লিখিত গ্রন্থপঞ্জিতে বর্ণিত পুস্তকাদির সর্বাধিক সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কিছু তথ্য উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সংরক্ষিত রেকর্ড ও পরিসংখ্যান থেকে। বিশেষ করে ব্যুরো কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের, তদন্তকার্য পরিচালনা এবং বিচারের জন্য কোর্টে সোপর্দ করার রেকর্ড পত্র হতে। এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও পত্রিকারও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ১০০ জন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকের উপর। সমীক্ষা পত্রে দশটি প্রশ্ন রাখা হয়। এতে দুর্নীতির প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার নিরূপণের জন্য প্রয়াস চালানো হয়।

প্রশ্নসমূহে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার কারণ, সর্বাধিক দুর্নীতির আমল ও সময়, দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক শ্রেণী, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবণতার কারণ, সরকারী কর্মচারীদের যে শ্রেণী বা পর্যায়ে দুর্নীতির পরিমাণ বেশী, দুর্নীতি বলতে যা বুঝায়, দুর্নীতি প্রসার ও বিস্তার এর কারণ, সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রশ্ন রাখা হয়। এ প্রশ্নগুলির মাধ্যমে দুর্নীতি কি, কিভাবে এ ব্যাধি সমাজে বিস্তার লাভ করে এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিরূপনের প্রয়াস চালানো হয়। উত্তরদাতাগণ সকলেই শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের কিছু ব্যবসায় নিয়োজিত, কিছু কৃষিজীবী, কিছু চাকুরে। তাঁরা দুর্নীতির কারণ ও বিস্তার সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রতিরোধের বিষয়ে অধিকাংশই দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনকে সবচেয়ে বেশী সহায়ক বলে মত প্রকাশ করেন। প্রদত্ত মতামত সমূহের যুক্তিযুক্ত কারণ ও ভিত্তি রয়েছে। প্রদত্ত মতামতের আলোকে সমাজে দুর্নীতি নামক এ ব্যাধির প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

প্রথম অধ্যায়

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির দুষ্ট ব্যাধি ছেয়ে গেছে। এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষিত সচেতন লোক মাত্রই এ বিষয়ে শিক্ষিত, ক্ষুদ্র ও সমালোচনা মুখর যদিও এ সত্যটি প্রমাণ ও প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসা লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। দুষ্ট রাহুর গ্রাস থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা ও উদ্যোগ সমাজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রতিকার প্রতিরোধের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না সমাজের কোন স্তরেই। আর তাই এ ব্যাধি গ্রাস করে নিচ্ছে সমাজের সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এমন কোন স্তর বা প্রতিষ্ঠানের নাম করা যাবে না যেখানে দুর্নীতি নেই। বিরাজিত এরূপ পরিস্থিতিতে যারা সৎ ও নৈতিক জীবন যাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা এর যাতাকলে গুমরে মরছেন আর ভাবছেন এর শেষ কোথায়।

১.২ দুর্নীতির এই দুষ্ট গ্রহ সমাজ জীবনের সৌরভ আর সমৃদ্ধি কুরে কুরে খেয়ে রক্ত শূন্য করে ছেড়েছে। দুর্নীতির শেকড় গ্রথিত সমাজের অনেক গভীরে। এর চর্চা মানব সভ্যতার মত প্রাচীন। শেকড় উপড়ে সমাজ জীবনে এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা সহজ কাজ নয়। তাই কেবলমাত্র এর আকার, প্রকার, প্রকৃতি ও বিস্তার নিরূপণ করার লক্ষ্যে এ প্রচেষ্টা। এর কিছুটা নিরূপণ করা গেলেও সামাজিভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ দুর্নীতির সংজ্ঞা

২.১ দুর্নীতি দমন বিশ্বে বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। বিশ্বের প্রত্যেক দেশই কম বেশী দুর্নীতির সমস্যায় আক্রান্ত। তবে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এ সমস্যায় বেশী জর্জরিত। দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির লাভবান হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজ ও অর্থনীতির উপর এর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই সার্বিক বিচারে দুর্নীতি সব সময়ই নেতিবাচক। সম্পদ পাচার, নিয়ম বর্হিভূতভাবে সম্পদ অর্জন, ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং দারিদ্রের কারণে দুর্নীতি, সরকারী আমলা মহলের ঘুষ গ্রহণ, অসাধু ব্যবসায়ী মহলের চোরাকারবার, কালোবাজারী, মজুতদারী, শিল্পপতিদের শিল্পের নামে অবৈধ ঋণ গ্রহণ ও ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রসার ঘটায়।

২.২ দুর্নীতির কোন সাধারণ বা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। এর কারণ হল কিছু অপরাধ সকল দেশেই দুর্নীতি বলে চিহ্নিত হলেও বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি প্রতিরোধকারী সংস্থাগুলোর তালিকাভুক্ত অপরাধের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। তাই প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব অপরাধের তালিকার ভিত্তিতে দুর্নীতির বিষয়টি অনুধাবন করে থাকে।

২.৩ সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে আমরা নীতি বা আইন বিরুদ্ধ কাজকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সকল আইন বিরুদ্ধ কাজকেই দুর্নীতি বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কেননা, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, বাংলাদেশ, বাংলাদেশের আইন বিরুদ্ধ সকল অপরাধেরই অনুসন্ধান বা তদন্ত করে না। দুর্নীতি দমন ব্যুরো যে সমস্ত অপরাধের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমকে পরিচালিত করে থাকে। নিচে দুর্নীতির একটি সাধারণ সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করা হলঃ

ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে যদি কোন পক্ষ শুধু তার একক অথবা তার এবং অপর পক্ষের, পক্ষসমূহের যৌথ আর্থিক এবং অথবা বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্যে অন্য কোন পক্ষের পক্ষসমূহের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে আইন পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হলে তাহলে ঐ কাজকে দুর্নীতি বলে অভিহিত করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতির বিস্তার

৩.১ মানব সভ্যতায় কবে, কোথায় এবং কার মাধ্যমে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটে তা একটি গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলার মত কোন দালিলিক প্রমাণ

নেই। তবে ধারণা করা যায় যে দুর্নীতি কোন সাম্প্রতিক বিষয় নয়। যদিও এই মুহূর্তে ব্যাপকতার কারণে বিষয়টি বহুলালোচিত।

৩.২ ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে সাধারণতঃ গণসমর্থনহীন শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের সময় এবং পরে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর সাথে দুর্নীতির মাধ্যমে হাত মিলিয়ে থাকে। এই ধরনের দুর্নীতিকে আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। অবিভক্ত ভারতের ইতিহাসে এই ধরনের দুর্নীতির সবচেয়ে বেশী প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ইংরেজ কোম্পানী তাদের এদেশীয় দোসরদের সাথে দুর্নীতির মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। ‘আওরঙ্গজেবের আমল থেকেই ইংরেজ বণিকদের দূষ্টি এমনভাবে চলে আসছিল যে নবাবের পক্ষে সন্দিক্ত ও রুষ্ট হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। নবাবের রাজস্ব যাতে হ্রাস পায় এবং বিদেশীর অর্থলাভ বাড়ে তাই কোম্পানী বহু ব্যক্তিকে অসঙ্গতভাবে ‘দস্তক’ ব্যবহার করতে দিত, শুদ্ধ না দিয়ে ব্যবসা করার সুবিধার এই অপব্যবহারে ইংরেজগণ অভ্যস্ত ছিল।’

৩.৩ মুর্শিদাবাদে তখন সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র বেশ অগ্রসর হয়ে চলেছিল। আলীবর্দীর প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ছিলেন এই চক্রের একজন নায়ক। মসনদ সম্বন্ধে প্রথম থেকেই তাঁর লোভ ছিল। আর সিরাজও ঈর্ষান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিণ্ডজয় করার ক্ষমতা রাখতেন না। মীর জাফর মুর্শিদাবাদে ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটসনের মারফত ক্লাইভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সেনাপতি রায়দুর্লভ, পদস্থ রাজপুরুষদের মধ্যে ইয়ার লতিফ খান, অর্থের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষমতা বিসর্জনে প্রস্তুত, জগৎশেঠের মতো ব্যক্তিকে চক্রান্তে যোগ দিতে দেখা গেল। আগে থেকে নিজেদের ভাগ স্থির করার জন্য এই কুচক্রীদল দল ১০ই জুন তারিখে এক চুক্তিপত্র খাড়া করেছিল।

কুখ্যাত উর্মিচাঁদ শেঠ লুটের মোটা ভাগ দাবি করে বসায় কুটকৌশলী ক্লাইভ ‘শঠে শঠাং’ নীতিবাক্য অনুসরণ করে এক জাল চুক্তি খাড়া করে, অনিচ্ছুক ওয়াটসনের দস্তখত জাল করে উর্মিচাঁদকে ঠকাবার বন্দোবস্ত করলেন। নকল চুক্তিতে বলা হল যে উর্মিচাঁদ মোটা টাকা পাবে, অথচ আসল চুক্তিতে তার কোন উল্লেখ রইল না। ক্লাইভ পরে অনবরত বলতেন যে, বদমাস উর্মিচাঁদকে জব্দ করতে দুর্নীতির পথে যাওয়াই হল নীতিসঙ্গত।

১। হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ভারবর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ২৭৪

অবশ্য স্বয়ং ক্লাইভ এবং অন্যান্য জাঁদরেল ইংরেজরা নিজেদের পকেটে বাংলার ধনদৌলত লুটে নিয়ে যাওয়ার যে বন্দোবস্ত করলেন তা দেখে বদমাস যে কারা, তা বুঝতে দেরি হয়নি। স্বদেশী ও বিদেশী বদমাসদের দল একত্রিত হয়ে দেশদ্রোহিতা এবং চারিত্রিক অধঃপতনের জঘন্য দৃষ্টান্ত তখন উপস্থাপিত করেছিল।^১

৩.৪ দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নবাব সিরাজদৌলাকে মসনদ থেকে হটানোর পর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি ও লুটপাট শুরু হয়ে যায়। মীর জাফরকে মসনদে বসিয়ে ক্লাইভ পুরস্কার পেলেন ২,৩৪,০০০ পাউন্ড। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীরা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউন্ড। ক্লাইভ দলিলদস্তাবেজ জাল করিয়ে এমন ব্যবস্থা করলেন যে উর্মিচাদের ভাগ্যে কিছুই জুটল না। ৮৮০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে চব্বিশ পরগনার জমিদারী কোম্পানীর হাতে গেল, বৎসরে এখান থেকে মোটামুটি দেড় লক্ষ পাউন্ড খাজনা আদায় হত। এই চব্বিশ পরগনা পরে ক্লাইভকে জায়গীর হিসেবে দেয়া হয়। তোশাখানা প্রায় শূন্য হয়ে পড়ায় নবাব ক্লাইভকে অনুন্নয় করে কয়েকটি শর্তে রাজী করান, স্থির হল যে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের ভূমিরাজস্ব থেকে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা পাবেন, সাড়ে দশ লক্ষ পাবেন বর্ধমান, কৃষ্ণনগর আর হুগলী থেকে আর তারপর বৎসরে উনিশ লক্ষ টাকার জন্য ঐ তিনটি জেলা বন্ধক হয়ে থাকবে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে কোম্পানী চাকুরীয়াদের বেতন অত্যন্ত অল্প দিত বলে তারা উপটোকন নিতে অভ্যস্ত ছিল, আর উপটোকন গ্রহণে কোন নিষেধও ছিল না। পলাশীর পর অর্থ লাভের ব্যাপারে মাত্রা জ্ঞান আর রইল না। কামধেনুকে দোহন করার এক উন্মাদ আবেগ যেন তখন এসে গিয়েছিল, কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে সর্বস্তরে তখন নিছক নিজেদের স্বার্থে যথাসম্ভব দ্রুত বিপুল সমৃদ্ধি সংগ্ৰহের কামনা উদগ্ৰ হয়ে উঠেছিল। কিছুকাল পরে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রীরঙ্গপত্তমের লুণ্ঠন থেকে লর্ড ওয়েলেসলিকে উপযাচক হয়ে এক লক্ষ পাউন্ড উপহার দিতে গেলে তিনি নাকি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। ওয়েলেসলির দৃষ্টান্তকে ব্যতিক্রম বলা চলেঃ ক্লাইভের আমলে কোম্পানীর ইংরেজ চাকুরিয়ারা সকলে মিলে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে একেবারে নির্লজ্জভাবে প্রবৃত্ত হয়েছিল।^২

৩.৫ মীরজাফরের পরিবর্তে তার জামাতা মীর কাশেমকে মসনদে বসানো হয়। কিন্তু দুর্নীতি এবং লুটপাট আগের মতই চলতে থাকে। কোম্পানীর দাবি-দাওয়া মিটিয়ে বর্ধমান মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দিয়ে ভ্যাগ্‌সিটাকে ৫০,০০০ পাউন্ড হলওয়েলকে ২৭,০০০ পাউন্ড এবং কাউন্সিলের অপর সদস্যদের প্রত্যেককে দশ থেকে পঁচিশ হাজার পাউন্ড ঘুষ দিয়ে মীর কাশেম যেন ‘পাপ চুকিয়ে’ শাসন কার্যে মনোযোগ দিলেন।^৩

২। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬

৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬

৪। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬

৩.৬ ইংরেজদের সঙ্গে মীর কাশেমের ঝগড়া বাধতে দেবী হল না। আর স্বভাবতই ঝগড়া বাধল বাণিজ্য নিয়ে। ইংরেজ কোম্পানী বিনা শুক্কে আমদানী ও রপ্তানীর অধিকার পেয়েছিল। এরই কদর্থ করে কোম্পানী কর্মচারীরা নবাবের অনুমতি পেয়ে দস্তক নামে ছাড়পত্রের প্রচণ্ড অপব্যবহার আরম্ভ করল। দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে যে শুক্ক দেয় তা এড়াবার জন্য খুশীমত যে কোন পণ্যদ্রব্যকে দস্তকের জোরে বিনা শুক্কে স্থান থেকে স্থানান্তরে পাঠানো হতে লাগল; ইংরেজ কোম্পানী এবং তার কর্মচারী ও আশ্রিতের দল এই দস্তক ভাঙ্গিয়ে মোটা লাভ করতে লাগল। সরকারের রাজস্ব নষ্ট হল। এ দেশের ব্যবসায়ীরা শুক্ক দিতে বাধ্য হওয়ায় প্রতিযোগীতায় কোম্পানী এবং তার অনুচরদের কাছে মার খেল। লাভ হল কোম্পানীর আর তার অনুগতদের অথচ লোকসান হল সরকারের এবং প্রায় সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের।^৫

৩.৭ মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী, কোম্পানীর দুর্নীতি, জালিয়াতী ও ক্ষমতার অপব্যবহারের এক জলন্ত নজির। ১৭৭৫ সালে মহারাজ নন্দকুমার নামে নবাবী আমলের এক প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ কর্মচারী অভিযোগ করেন যে হেষ্টিংস মীর জাফরের বিধবা পত্নী মনি বেগমকে নাবালক নবাবের অভিভাবিকা হিসেবে মানোনয়নের মূল্য হিসেবে প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করেন। কাউন্সিলের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যগণ হেষ্টিংসকে দোসী সাব্যস্ত করে তাকে ঐ অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। হেষ্টিংস নন্দকুমার এর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেন যে তিনি কামালউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনতে প্ররোচিত করেছেন। এ বিষয়ে যখন তদন্ত চলছিল তখন মোহন প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দ কুমার এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনেন। সুপ্রীম কোর্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। একজন বিশেষজ্ঞ এ প্রাণদণ্ডকে বিচারের নামে হত্যা (Judicial Murder) হিসাবে অবিহিত করেন। নন্দকুমার এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। বিচারকগণ বিশেষত হেষ্টিংস এর বন্ধু স্যার এলিজা ইম্পে, নন্দকুমার এর প্রতি বিরূপ ছিলেন। ইংল্যান্ডে যে আইনে জালিয়াতির জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল তা ভারতবর্ষের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানরত অবস্থায় নন্দকুমার এর ফাঁসী হয়। কোম্পানী আমলে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের এটা ছিল নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।^৬

৩.৮ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার এদেশীয় দোসরদের মাধ্যমেই মূলতঃ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় পর্যায়েই অখণ্ড ভারতে দুর্নীতির ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী ভূস্বামী জমিদার শ্রেণী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর। এর প্রাতিষ্ঠানিক

৫। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬

৬। ভারতের ইতিহাস। ডঃ অনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা - ৭৩

রূপ দেওয়া হয় প্রথম পর্যায়ে পাঁচশালা/দশশালা এবং পরবর্তীতে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড সরকার কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনের দায়িত্ব নিয়ে নেয়া সত্ত্বেও দুর্নীতি ও সম্পদ পাচার থেমে থাকেনি। বলা বাহুল্য যে সম্পদ পাচার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতির সর্বোচ্চ রূপ লাভ করে।

৩.৯ প্রায় দুইশত বছর ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে, ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। লোকবলের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা থাকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবৈধ সম্পদ পাচারের ঘটনা শুরু হয়।

৩.১০ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধানের মাত্রা ছিল খুব কম। কিন্তু পরবর্তী সরকারী নীতির ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের এক পাহাড় গড়ে উঠে। ১৯৫৯-৬০ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২ ভাগ এবং ১৯৬৯-৭০ সনে এই পরিমাণ হয় শতকরা ৬১ ভাগ। এইভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের স্থানান্তর ঘটে। পরিকল্পনা কমিশনের এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সন হতে ১৯৬৯-৭০ সন পর্যন্ত সরকারী পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে হস্তান্তর হয়েছে আনুমানিক ৩,১১২ কোটি টাকার সম্পদ (প্রতি বছরে ১৫৫৬ কোটি টাকার মত)।^৭ বেসরকারীভাবে সম্পদ পাচার হয়েছে আরো কয়েকগুণ বেশী। আর তা করে সে আমলের ২২ পরিবার।

৩.১১ এইভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদ পাচারের ঘটনার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও দুর্নীতির সূত্রপাত ঘটে। এর জন্য দুটো কারণকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। এর প্রথমটি হল সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক “মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯” (Basic Democracies Order, 1959) এই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সমগ্র দেশে মৌলিক গণতন্ত্রীদেব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ভোটে জেনারেল আইয়ুব জাতির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।^৮

৩.১২ দ্বিতীয় কারণটি হল ১৯৫৮ সাল থেকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের শুরু। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী সরকারী অর্থ আত্মসাতের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

৭। এমাজ উদ্দিন আহম্মদ, পৌরবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ অক্টোবর, ১৯৭৯,

পৃষ্ঠা- ৮৭-৮৮

৮। ডঃ মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৮৩৬

এর ধারাবাহিকতায় আজও এ দেশের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত ব্যাপক দুর্নীতি ঘটছে।

৩.১৩ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলন পাকিস্তানী শাসকদের অনমনীয় মনোভাব ও অত্যাচারের কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দুর্নীতি নির্মূল না হয়ে বরং সমাজের বহু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতাউত্তরকালে নিম্নলিখিত ঘটনা সমূহ এই দুর্নীতি বিস্তারের মূল কারণ।

প্রথমতঃ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যুদ্ধবিক্ষস্ত বাংলাদেশে স্বল্প পরিমাণ যে বৈদেশিক সাহায্য আসে তা কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি হস্তগত করে। এর সাথে যোগ হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুদদারী ও কালোবাজারী। দেশ পুনর্গঠনের এ পর্যায়ে সরকারের পক্ষে নানা কারণে এ দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলস্বরূপ দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা ক্ষমতাবান হয়ে উঠে এবং ব্যাপক দুর্নীতি বিস্তারে সক্রিয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ বৃহৎ বেসরকারী বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বিচার রাষ্ট্রীয়করণ এবং আমদানী-রপ্তানীর সিংহভাগ সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং পারমিট প্রদানের মাধ্যমে পরিচালিতকরণ। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এ সময় যোগ্য নির্বাহীর অভাব প্রকল আকার ধারণ করে। সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একটি অংশ দেশসেবার সুযোগ প্রাপ্তিকে সদ্যবহার না করে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর্থিক ক্ষতির কারণ বিশ্লেষণ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দুর্নীতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ যথাযথ শিল্পনীতি গ্রহণ না করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত আমদানী নির্ভর হয়ে পড়ে। এর চাপ পড়ে স্থানীয় মুদ্রার উপর। টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়ন সকল প্রকার দ্রব্যাদির দামকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে। সে তুলনায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি না ঘটায় প্রকৃত মজুরী ধীরে ধীরে কমতে থাকে। জীবন যাত্রার ন্যূনতম মানকে বজায় রাখতে গিয়ে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি বড় অংশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

চতুর্থতঃ সার্বিক নেতিবাচক অবস্থার সুযোগে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সামরিক শাসকদের রাজনীতি করার অভিলাষ এবং তাদের ব্যাপক জনসমর্থন না থাকায় তাদের আশেপাশে সুবিধাবাদীদের ভিড় জমে উঠে। এ সমস্ত ব্যক্তি নিজেদের

ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি আরো বিস্তার লাভ করে। ক্ষমতাকে সুসংহত করতে গিয়ে সামরিক শাসকগণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর চেয়ে রাজনৈতিক বিষয় বেশী গুরুত্ব প্রদান করে। যথাযথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার ফলে স্থানীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে গুরুত্বহীন পর্যায়ে নেমে আসে। ফলে দেশ চালাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চাহিদা মেটাতে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ থেকে অনুকূলে সাড়া পাওয়া গেলেও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এর একটি অংশ চলে যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, সরকারী কর্মচারীদের নিকট, বাকী অংশ যায় সুবিধাবাদী একটি গোষ্ঠীর পকেটে।

পঞ্চমতঃ দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সৃষ্টি করা হলেও দুর্নীতি বিস্তারের সাথে তাল রেখে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ না করার ফলে ব্যুরো তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়। বড় বড় দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির দুর্নীতি করে সহজে পার পেয়ে যাওয়ার সংযোগ থাকার কারণে দুর্নীতির বিস্তার রোধ করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ষষ্ঠতঃ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সাথে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিমাণ বাড়তে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটানোর পূর্বে প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই সমস্ত প্রকল্পে দুর্নীতি একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ দুর্নীতির প্রকৃতি

৪.১ দুর্নীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার পূর্বে দুর্নীতির প্রকারভেদ আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করলেই দুর্নীতির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। দুর্নীতির প্রকারভেদ দু'ভাবে করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে দুর্নীতি ঘটেছে তাদের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়তঃ যে সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঘটেছে সেগুলোর ভিত্তিতে।

৪.২ প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দুর্নীতিকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ক) ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সংঘটিত দুর্নীতিঃ সরকারের কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দুর্নীতি ঘটানো যে একটি পুরাতন বিষয় তা আমাদের এ আলোচনার প্রথম দিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকার

कारणे एदेर पक्षे इच्छा करले दुनीतिर आश्रय ग्रहण करा अत्यन्त सहज साध्य व्यापार । साम्प्रतिक समये देशे देशे ए धरणेर वेश किछु दुनीतिर तथ्य उदघाटित ह्येछे । दक्षिण कोरियाय दुई साबेक प्रेसिडेन्ट रो तायेउ ओ चुन डू होयान, भारतेर प्राक्तन मन्त्रि नरसिमा राओ ओ कयैकजन प्राक्तन मन्त्री, पाकिस्तानेर साबेक प्रधान मन्त्री बेनजीर भूट्टोर स्वामी आसिफ आली जारदारीसह जापानेर वेश कयैक जन साबेक प्रधान मन्त्री, फिलिपाइनेर साबेक प्रेसिडेन्ट मार्कोस एवं बांग्लादेशेर साबेक प्रेसिडेन्ट एरशादओ अन्यान्य आरो अनेकेर साथे एही तालिकार अन्तर्भूक्त ।

ख) सरकारी कर्मकर्ता ओ कर्मचारीदेर दुनीतिः सरकारेर कार्यक्रम बास्तबायनेर दायित्व सरकारी कर्मकर्ता कर्मचारीदेर उपर न्यस्त थाकार कारणे एरा दुनीति करार मत अवस्थाने থাকे, फले अनेक ক্ষेत्रेई एदेर माध्यमे दुनीति संघटित ह्ये থাকे । मूलतः एही ऋपेर दुनीतिर परिमाण ओ संख्याई सबचेये वेशी, विशेष करे आमामेदर मत तृतीय विश्वेर देशगुलोते । तवे ए धरणेर दुनीतिर साथे केवल सरकारी कर्मकर्ता ओ कर्मचारीरा नय अनेक क्षेत्रे बेसरकारी व्यक्ति वा प्रतिष्ठान एवं व्यावसायी ओ पुंजिपतिमहल जड़ित থাকे । ग) बेसरकारी दुनीतिः ये सकल दुनीतिते शुधुमात्र बेसरकारी व्यक्ति वा प्रतिष्ठान जड़ित থাকे ताके बेसरकारी दुनीति বলে चिह्नित करा याय । ए धरणेर दुनीतिर वेशीर भागई जमि-जमार मालिकाना संक्रान्त वा प्रतारणार माध्यमे अर्थ आग्रसां संक्रान्त । समाज वा अर्थनीतिर उपर ए धरणेर दुनीतिर प्रभाव पूर्वे उल्लेखित दुनीतिर चेये अनेक कम । चोराकारवारी, मजुतदारी ओ कालोबाजारी ए पर्यायभूक्त दुनीति বলে गन्य करा येते पारे । किन्तु अर्थनीतिर उपर एर प्रभाव प्रकट ।

४.३ निम्नलिखित विषये सरकार ओ समाजेर विभिन्न क्षेत्रे दुनीति घटे থাকेः

क) प्रकल्ले दुनीतिः सरकार देशेर आर्थ-सामाजिक उन्नयनेर लक्ष्ये तार नीतिर साथे सामञ्जस्य रेखे विभिन्न धरणेर प्रकल्ल ग्रहण करे থাকे । ये कोन प्रकल्लेर प्रणयन थेके बास्तबायन पर्यन्त अनेकगुलो पर्याय থাকे । एकटि प्रकल्ल प्रणयन थेके गृहीत हओया पर्यन्त सरकारेर संश्लिष्ट विभाग ओ मन्त्रणालय, परिकल्लना मन्त्रणालय, मन्त्रि परिषद ओ जातीय अर्थनैतिक काउन्सिलेर निर्वाही कमिटी (ECNEC) एर भूमिका থাকे । प्रकल्लेर ए पर्याये संश्लिष्ट विभाग, मन्त्रणालयसमूह वा कमिटीर ये कोन कर्मकर्ता, सदस्य अथवा संश्लिष्ट कोन व्यक्ति वा व्यक्तिवर्ग कर्तृक निजस्व स्वार्थ सिद्धिर उद्देश्ये प्राक्कलन तेरीर समय कारचूपिर माध्यमे अतिरिक्त खरच देखानो वा निर्दिष्ट काउके सुविधा प्रदानेर उद्देश्य शर्तावली शिथिलकरणेर मत दुनीतिर घटना अनेक क्षेत्रेई देखा याय ।

एकटि प्रकल्ल गृहीत हओयार परे तार बास्तबायनेर प्रसङ्गटि चले आसे । बास्तबायनेर पूर्वे ठिकादार नियोगेर उद्देश्ये दरपत्र आहवान करा हय । कार्यादेश

প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দুর্নীতি ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ না প্রদান করে পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে তাকে বা তাদেরকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়ে থাকে। ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে কখনো কখনো দুর্নীতির উদ্দেশ্যে পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা অথবা স্বল্প প্রচারিত বা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে দুর্নীতির মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার সকল কপি ক্রয় করা হয়ে থাকে। এর ফলে পূর্ব নির্ধারিত ঠিকাদার ব্যতীত আগ্রহী অন্যান্য ঠিকাদাররা ঐ দরপত্র বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে না জানায় দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এতে করে পূর্ব নির্ধারিত ঠিকাদারকে কাজ প্রদান করা সহজতর হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যে সকল দুর্নীতি অনেক সময় ঘটে থাকে সেগুলো হচ্ছে শর্তে উল্লেখিত মানসম্পন্ন মালামালের চেয়ে নিম্নমানের মাল ব্যবহার করা, সরবরাহকৃত মালামাল চুরি করা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক আংশিক বা পূর্ণ বিল পাশ ও প্রদানের সময় উৎকোচ গ্রহণ, কাজের নির্ধারিত মানকে বজায় না রাখা ইত্যাদি।

খ) সরকারী রাজস্ব আদায়ে দুর্নীতিঃ সরকারী ব্যয় নির্বাহের দুটি উপায় থাকে। একটি অভ্যন্তরীণভাবে রাজস্ব আদায় এবং অপরটি বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থাসমূহ থেকে ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করা। প্রথমটি জনসাধারণের উপর ধার্যকৃত কর, এবং নানা রকম সরকারী ফি। করের বৃহত্তম অংশ আসে পরোক্ষ কর যথা আমদানী শুল্ক, আবগারী, ভ্যাট ইত্যাদির মাধ্যমে। ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পণ্য আমদানী, ঘোষিত মানের চেয়ে উন্নতর পণ্য আমদানী, এক পণ্যের স্থানে অন্য পণ্য আমদানী, ইত্যাদি নানাভাবে দুর্নীতি করা হয়ে থাকে সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি ভ্যাট আদায়ের ক্ষেত্রে কম বিক্রয় বা মূল্য সংযোজন দেখিয়ে কর ফাঁকি দেয়া হয়ে থাকে। এ সকল দুর্নীতির সাথে কর বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা থাকে। সরকারী রাজস্বের সিংহভাগ যেহেতু এই করারোপের মাধ্যমে এসে থাকে এ কারণে কর ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও সহজ করার প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে তেমন কর ফাঁকি দেয়াকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আধুনিক যুগোপযোগী করে এই ব্যবস্থাকে গড়ে তুলার প্রয়োজন রয়েছে।

গ) সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিঃ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের আর্থিক লেনদেন এর দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সরকারী বেসরকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে তালিকাভুক্ত প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইউনিটের কার্যক্রম নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা এ উদ্দেশ্যে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রেই

যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না। উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিষয় চেপে যান। পরবর্তীতে দুর্নীতি মহীকুহে পরিণত হলে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদেরকে ঋণের একটি নির্দিষ্ট ভাগ ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারী, সিবিএ নেতাদেরকে উৎকোচ প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। এ কারণে ঋণ গ্রহীতার ঋণের খরচ বেড়ে যায়। নানা কারণে ব্যবসা বাধাগ্রস্ত হলে এই ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা ব্যবসার নেট মূল্য - এর চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যায় এবং ঋণ আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতা উৎকোচ প্রদান করে এই মনোভাব পোষণ করেন যে যৈহেতু উৎকোচ প্রদান করেন সেহেতু ঋণ পরিশোধ করার আর প্রয়োজন হবে না। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেও বড় বড় ঋণ গ্রহীতার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধ করে না। কাগজে কলমে ঋণের যথাযথ ব্যবহার দেখানো হলেও অনেক ক্ষেত্রে অন্য কাজে এ টাকার ব্যবহার ঘটে। নিয়মানুযায়ী পর্যাপ্ত জামানত না নেওয়া অথবা কারচুপির মাধ্যমে জামানতের মূল্য প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দেখানোর মত দুর্নীতিও ঘটে থাকে। অন্যদিকে কাংখিত ঋণ প্রাপ্তির আশায় ঋণগ্রহীতারা ব্যবসায় প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ না করে মিথ্যা ও অতিরিক্ত ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। বেসরকারী ব্যাংকগুলোর আশ্রয় গ্রহণ করে ঋণ নিয়ে থাকেন। ওভার ইনভয়েসিং, আভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাচার, সরকারী রাজস্ব ফাঁকি এবং ছুড়ি ব্যবসার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার দেশে আগমনকে বাধাদান করা হয়। এই ধরনের দুর্নীতি দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। সর্বশেষ শেয়ার বাজারের দুর্নীতি এক সর্বনাশী রূপ ধারণ করেছে। প্রতিদিনের পত্র পত্রিকায় এ একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে।

ঘ) সরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোয় দুর্নীতিঃ সরকারী সেবামূলক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি। দেশে টেলিফোনের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় টেলিফোন সংযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকে হয়রানি এড়াতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীরা অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হন। অপেক্ষমান তালিকা সামনে থাকা ব্যক্তিদের টেলিফোন সংযোগ না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাধ্যমে পেছনে নাম থাকা ব্যক্তিদেরকে সংযোগ দেয়া হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল করে গ্রাহকদেরকে ঘুষ প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীরা বাধ্য হন। অতিরিক্ত বিলের বিরুদ্ধে আপীল করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায় না।

সিস্টেম লসের নামে বিদ্যুৎ চুরি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের সবচেয়ে বড় ধরনের দুর্নীতি। এছাড়া নতুন সংযোগ প্রদানের সময় অতিরিক্ত অর্থ

দাবী করা, ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে মিটার রিডিং কমিয়ে দেয়া, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা, বোর্ডে মালামাল চুরি করে বেশী দামে বাইরে বিক্রি করা, বোর্ডের অনেক কর্মকর্তা, কর্মচারীর জন্য সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারগণ কর্তৃক বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সরকারী দায়িত্ব অবহেলা করে প্রাইভেট প্রাকটিস চালানো, হাসপাতাল কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক হাসপাতালের ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী চুরি ও আত্মসাৎ করা, পছন্দসই প্যাথলজিক্যাল ও অন্যান্য ল্যাবরেটরী থেকে চিকিৎসাধীন রোগীদের প্রয়োজনে অথবা বিনা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করতে বাধ্য করে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরী থেকে নির্দিষ্ট পারসেনটেজ প্রাপ্তির মত দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকেন।

ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিঃ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার একটি পদক্ষেপ হিসেবে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং কিছু শিক্ষক, যোগসাজশের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত চাল-গমের চেয়ে কম পরিমাণ সরবরাহ করে বাকী অংশ আত্মসাৎ করেন। এ ছাড়া ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রেও অনেক সময়ই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা, ভর্তি পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা, অধিক অর্থ প্রাপ্তির বিনিময়ে অনিয়মিত ছাত্র ছাত্রীদের নিয়মিত দেখিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত ছাত্রী বৃত্তিতে নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রী সংখ্যা অধিক দেখিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। শ্রেণী শিক্ষকগণ শ্রেণী কক্ষে পাঠদান না করে প্রাইভেট পড়ানোর মাধ্যমে অধিক আয়ের পথ বেছে নেন। শিক্ষাস্থানের এই অরাজক অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও মুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকগণ শিক্ষকতা বাদ দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের কনসালটেন্ট কাজে নিজেদেরকে ব্যাপ্ত করেন।

চ) কাজের বিনিময়ে খাদ্যঃ বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত গমের মাধ্যমে এ কাজ করা হয়ে থাকে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে এ কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে এ সকল প্রকল্পে অনিয়ম, আত্মসাৎ ও দুর্নীতি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকল্পে বরাদ্দ প্রাপ্তিতে ঘুষ দিতে হয়। গম উত্তোলনে খাদ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয়। আনা নেওয়ার ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে আরো অনেককেই ভাগ/ঘুষ দিতে হয় বলে নির্ধারিত কাজ হয় না। আর এ সুযোগে প্রকল্পে নিয়োজিত তদারকী কর্মকর্তা ও প্রকল্প কমিটিও আত্মসাৎ এর সুযোগ পায়। ব্যুরোতে

প্রাপ্ত অভিযোগ এবং মামলার সংখ্যার সিংহভাগ খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচি দখল করে আছে।

ছ) ভূমি জরিপ ও ভূমি প্রশাসনে দুর্নীতিঃ ব্যক্তি মালিকানায় ভূমি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মালিকের মালিকানা সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধান সরকারের দায়িত্ব। তহশিলদারের ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ করা এবং ভূমি রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব। সহকারী কমিশনার রেকর্ড সংরক্ষণ ও রাজস্ব আদায়ে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি নিশ্চিত করেন। জরিপকালে জরিপ বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ মালিকানা নিরূপনান্তে জরিপ পূর্বক হাল নাগাদ মালিকানা নির্ধারণ করেন। এ সমুদয় কাজই যথা নিয়মে পালন করা নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব। বর্তমানে খাজনা প্রদান, জমা খারিজ করানো, জরিপে ভূমি রেকর্ড করানো ইত্যাদি সকল কাজে ঘুষ না দিলে কোন কাজই হয় না বলে জনমত রয়েছে।

জ) পুলিশ প্রশাসনে দুর্নীতিঃ দুষ্টির দমন শিষ্টের পালন পুলিশের দায়িত্বের অন্যতম স্তম্ভ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাধীদের আইন আমলে এনে বিচারের নিমিত্ত কোর্টে সোপর্দ করা পুলিশের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে থানাই, আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু। যে কোন অপরাধের প্রাপ্ত তথ্যই পুলিশ বাহিনীকে, অপরাধীকে আইন আমলে আনার জন্য তৎক্ষণিকভাবে তৎপর করে। কিন্তু বাস্তবে কোন ফরিয়াদী/অভিযোগকারী থানায় ফরিয়াদ/অভিযোগ জানাতে গেলে কিছু না দিলে তার অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না। অপর পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে আইন/শাস্তি এড়িয়ে যায় এ প্রকার জনমত রয়েছে। বিনিময় ও ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধী কোর্ট হতেও বের হয়ে আসে বা খালাস পায়।

ঝ) যে প্রকার বা প্রকৃতিতে সরকারী কর্মকর্তা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে লাভবান হয় অথবা অন্যকে লাভবান হতে সাহায্য করে তাকে দুর্নীতি বলে যা দুর্নীতির সংজ্ঞায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে সরকারী কর্মকর্তা পর্যায়ে দুর্নীতির প্রকৃতি ও প্রকার উল্লেখ করা গেল।

ঘুষ বা উৎকোচঃ সরকারী কাজ আদায়ের জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি নগদ টাকা প্রদান বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদানকে ঘুষ বা উৎকোচ বুঝায়। বৈধ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য যেমন ঘুষ দিতে হয় তেমনি অবৈধ কাজও ঘুষ দানের মাধ্যমে করিয়ে নেওয়া হয়। ঘুষ না দিলে কাজ পাওয়া যায় না, বিল পাশ হয় না। বড় কাজের জন্য বড় অংকের ঘুষ বা উৎকোচ দিতে হয়। আদেশ প্রাপ্তির জন্য ফাইল বা নথি নিচে হতে উপরে আবার উপর হতে নিচে উঠানামা করে। টাকা পয়সা ছাড়া উঠানামা হয় না। ঘুষ বা উৎকোচ দিলে দ্রুত নথি উঠানামা করে অনুকূলে সিদ্ধান্ত

পাওয়া যায়। ভারতের শান্তারাম কমিটি (১৯৬২) একে “স্পীড মানি” হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

স্বজনপ্রীতি বা নেপোটিজমঃ সরকারী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অথবা অন্যের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আত্মীয়-স্বজনদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া স্বজনপ্রীতি নামক দুর্নীতি ভুক্ত। সত্ত্বেও বা না জেনে অনেক সরকারী কর্মচারী এ দুর্নীতির সাথে জড়িত। অন্যের বেলায় একে অন্যায় মনে করা হলেও নিজের বেলায় এর যৌক্তিকতা খুঁজে বের করা হয় + নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণে একে আর দুর্নীতি বলে সাধারণত বিবেচনা করা হয় না।

প্রিয়তোষণ বা ফেভারেটিজমঃ সরকারী সুযোগ নিয়ে অনেক সরকারী কর্মকর্তা নিজের দপ্তরে এবং দপ্তরের বাইরেও প্রিয়তোষণকে অপেক্ষাকৃত বেশী অনুগ্রহ বা প্রীতি প্রদর্শন করেন যার ফলে প্রীতিভাজন ব্যক্তি অন্য একজনের ন্যায় সঙ্গত দাবী থাকা সত্ত্বেও অধিকতর সুবিধা ভোগ করেন। অনুপযুক্তকে বিশেষ স্থানে নিয়োগ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ কাজ কন্ট্রাস্ট পাইয়ে দেওয়াও দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার।

আত্মসাৎঃ আত্মসাৎ নগদ অর্থ হতে পারে, আবার মজুদ বা ভান্ডার সংরক্ষিত মালামালও হতে পারে। যখন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ভান্ডারে সংরক্ষিত মালামাল সরকারী কাজের জন্য সরবরাহ না করে নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহারপূর্বক সরকারের স্বার্থ এবং অর্থের ক্ষতি করে তখন তাকে আত্মসাৎ বলে। ব্যক্তি কর্তৃক অর্থ ও সম্পদ অবৈধভাবে দখল বা লাভ করা আত্মসাতের আওতায় পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য

৫.১ দুর্নীতি নামক এ সামাজিক ব্যাধির বৈশিষ্ট্য বিচিত্র রূপ। ইহা সমাজের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির গতিকে বাধাগ্রস্ত করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং ব্যাপকভাবে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুবিধাবাদী ব্যক্তি বিশেষের হাতে সম্পদকে পুঞ্জীভূত ও কুক্ষিগত করে। কালো টাকার পাহাড় জমে উঠে দুর্নীতিবাজ লোকদের হাতে। এতে এ সকল সুবিধাবাদী দুর্নীতিবাজ লোক অবৈধ অর্জিত সম্পদ বিদেশে পাচারে প্রয়াসী হয়। দেশ থেকে সম্পদ পাচার হয় দেশান্তরে। সম্পদের সুষম বন্টন হয় বাধাগ্রস্ত, ফলশ্রুতিতে দেশে বিনিয়োগের ও উৎপাদন হয় ক্ষতিগ্রস্ত, ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ হ্রাস পায়, দ্রব্য মূল্যের হয় উর্ধ্বগতি, ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। দুর্নীতির এ দুষ্ট বলয় দেশকে দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্রতর করে ফেলে।

৫.২ উপরের আলোচনা থেকে দুর্নীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়ঃ

১. দুর্নীতি ক্ষমতাবান অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে;
২. জনসমর্থনহীন সরকার ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে সুবিধাবাদীদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে থাকে;
৩. দুর্নীতি ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা, দ্রুত ধনসম্পত্তি অর্জন অথবা দারিদ্রের কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে;
৪. সমাজের উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি, এর দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করে থাকে;
৫. দুর্নীতি সমাজের কোন নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না এবং সমাজের প্রতিটি স্তরেই এর অশুভ প্রভাব ফেলে;
৬. দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের আন্তরিকতার অভাব দুর্নীতি বিস্তারের সহায়তা করে থাকে;
৭. সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করা হলে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করে;
৮. দুর্নীতি, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের লাভবান করলেও বাকী সকল লোকের জন্য ক্ষতিকারক;
৯. দুর্নীতির ফলে দ্রুত সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে;
১০. দুর্নীতির ফলে সরকারী সম্পদের অপচয় ঘটে;
১১. দুর্নীতি সরকারের উন্নয়নমূলক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে;
১২. দুর্নীতি দেশ ও সমাজের জন্য সর্বদাই নেতিবাচক;
১৩. দুর্নীতি সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনে বাধার সৃষ্টি করে;
১৪. দুর্নীতির ফলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়;
১৫. দুর্নীতির ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায়। মাথা পিছু আয়ের হার কমে যায়;
১৬. দুর্নীতির ফলে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়;
১৭. দুর্নীতি সমাজ ও দেশকে দরিদ্র হতে দারিদ্রতর করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০ ১৯৭২-৯৬ সন পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যারোর পরিসংখ্যানে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্রঃ

৬.১ স্বাধীনোত্তরকালে বাংলাদেশে দুর্নীতির অভিযোগ, মামলা ও তদন্ত চিত্র নিম্নে তিনটি সারণীতে দেওয়া গেল। এর পূর্ববর্তী সময়ের কোন তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোতে সংরক্ষিত না থাকার ফলে তা দেওয়া সম্ভব হলো না। ১নং সারণীতে ১৯৭২-৮০ সন

পর্যন্ত এবং ২নং সারণীতে ১৯৮১-৯০ সন পর্যন্ত এবং ৩নং সারণীতে ১৯৯১-৯৬ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগ, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ, দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা, দাখিলকৃত চার্জশীটের সংখ্যা, অনুমোদনকৃত চার্জশীটের সংখ্যা, বিচারে সাজা প্রাপ্তির সংখ্যা এবং খালাসের সংখ্যা দেওয়া হলোঃ

সারণী-১
(১৯৭২ - ১৯৮০)

সন	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীটের সংখ্যা	এফ, আরটির সংখ্যা	সাজার সংখ্যা	খালাসের সংখ্যা
১৯৭২	৫৫০৯	৩২৭৯	৪৫৭	৩২৭	১৩০	২০০	১০৯
১৯৭৩	৮৮৬৬	৪৫৫০	৬৬৭	৪৫২	২১৫	২২৮	১৯২
১৯৭৪	৫৮৬৭	৭০০৯	৯২৭	৬৪৭	২৮০	৩৭০	১৮৮
১৯৭৫	৭৪২৪	৭৫২১	৮০৬	৪৩১	২৭৫	১৮৫	১৪১
১৯৭৬	৭১০৭	৯২২২	৮৬৬	৬২২	২৪৪	২০০	১২০
১৯৭৭	৭২৯১	৮৭৬৬	৭৮৬	৫৩০	১৬৫	৯৫	৫৪
১৯৭৮	৬৪৮৩	৮২৮৯	১০৪৬	৮৫২	১৯৪	১৮৫	১৩০
১৯৭৯	৭৪৮১	৭১৫২	১৩৮৭	৮৭৪	৫১২	১২০	১০৩
১৯৮০	৮৪৮৯	৭৯৮৫	১৪২৫	৭৯৬	৬২৮	৮০	৩২
মোট	৬৪৫১৭	৬৩৭৭৩	৮৩৬৭	৫৬৩১	২৬৪৩	১৬৬৩	১০৬৯

সারণী-২
(১৯৮১ - ১৯৯০)

সন	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীটের সংখ্যা	এফ, আরটির সংখ্যা	সাজার সংখ্যা	খালাসের সংখ্যা
১৯৮১	৮৩৮৬	৯২৫২	১২৮১	৬৯৫	৫৮৫	৫৫	৩৯
১৯৮২	১১৯৪৩	৯৮০৩	১২৩০	২৩১৯	৪১১	৫৪৮	২৫৯
১৯৮৩	১০১৪৬	৯৮৯৩	১৯৪৪	১২৭২	১১৭	৯২৫	৭৫৭
১৯৮৪	১১৯২০	১০৫৫১	১৬৪৫	১১৫০	২৯৬	৩২৩	৩১৮
১৯৮৫	১৩৭৪০	১৩৫৪৬	১৫৭৮	১০০৫	২৩৬	২১১	৩৩৪
১৯৮৬	১১৪০৫	১২৭৮৩	৮৪২	৫০১	১৮৬	২৫৮	৪৪৪
১৯৮৭	১০৫৫	৮৫৬৮	১৩২৫	৪০৬	১৩৯	২৩৫	২২৫
১৯৮৮	৮৮৪৯	৭৭৩০	১১৮৭	৭০৮	৭১	২০১	২২৫
১৯৮৯	৭৩২৮	৯৬৪৮	৮৫৬	৬২৭	৭৯	২৫০	৩১৫
১৯৯০	৩২৮৮	৯৬৬৯	৪৯২	৬০২	১১৯	৩০২	৩১৫
মোট	৯৭৫৬০	১০৪৪৩	১২৩৮০	৯২৮৫	২২৩৯	৩৩০৮	৩২৩১

সারণী-৩
(১৯৯১ - ১৯৯৬)

সন	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীটের সংখ্যা	এফ, আরটির সংখ্যা	সাজার সংখ্যা	খালাসের সংখ্যা
১৯৯১	৩৩৯৪	৩০৫৮	৫৯৬	৪৩৩	১০৪	৩৪৩	৩৬৩
১৯৯২	৫২৯৬	৫১৬১	১০২১	৭৬৩	১৮৭	২৪৯	৩১৫
১৯৯৩	৬০৮৫	৬৭৭৩	১৩৮৪	১০৩০	২৪২	১৫৯	২৭৪
১৯৯৪	৬৫৫৯	৫৯৪৬	১৬৬১	১২০১	১২৯	২১৫	২৮৬
১৯৯৫	৬৩৯৫	৪১৭৩	৮১৭	৭৬৪	১৬৭	২৪৯	৩১৫
১৯৯৬	৪২১৯	৩৩৮৭	৪২৭	৩৫৫	২৩০	২০৪	২৫৪
মোট	৩১৯৪৮	২৮৪৯৮	৫৯০৬	৪৫৪৬	১০৫৯	১৪১৯	১৮০৭

৬.২ তিনটি সারণীতে প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭২-৮০ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৬৪,৫১৭, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৬৩,৭৭৩ দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৮৩৬৭, চার্জশীটের সংখ্যা ৫৬৩১, এফ, আরটির সংখ্যা ২৬৪৩, সাজার সংখ্যা ১৬৬৩, খালাসের সংখ্যা ১০৬৯, (সারণী-১)। ১৯৮১-৯০ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৯৭,৫৬০, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ১০০৪৪৩, দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১২৩৮০, চার্জশীটের সংখ্যা ৯২৮৫, এফ, আরটির সংখ্যা ২২৩৯, সাজার সংখ্যা ৩৩০৮, খালাসের সংখ্যা ৩২৩১ (সারণী-২)। ১৯৯১-৯৬ সন পর্যন্ত ব্যুরোতে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৩১৯৩৮, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ২৮৪৯৮, দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৫৯০৬, চার্জশীটের সংখ্যা ৪৫৪৬, এফ, আরটির সংখ্যা ১০৫৯, সাজার সংখ্যা ১৪১৯, খালাসের সংখ্যা ১৮০৭ (সারণী-৩)। উপরের তিনটি সারণীতে বর্ণিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সারণী-২ এ ১৯৮১-৯০ পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগ, দায়েরকৃত মামলা, দাখিলকৃত চার্জশীট, এফ, আরটি, সাজা প্রাপ্তি ও খালাসের সংখ্যা সর্বাধিক। তার মধ্যে ১৯৮২ এবং ১৯৮৩ সালে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক মামলায় সাজা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বর্ণিত সময়ে সামরিক আদালতে বিচার হয়। তিনটি সারণীতে দায়েরকৃত মামলা অনুসারে সাজা প্রাপ্তির হার সারণী-৪ এ দেওয়া হলোঃ

সারণী-৪

সারণী নং	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সাজা প্রাপ্তির সংখ্যা	সাজা প্রাপ্তির শতকরা হার %
সারণী-১ (১৯৭১-৮০)	৮৩৬৭	১৬৬৩	১৯.৮৭%
সারণী-২ (১৯৮১-৯০)	১২৩৮০	৩৩০৮	২৬.৭২%
সারণী-৩ (১৯৯১-৯৬)	৫৯০৬	১৪১৯	২৪.০২%

সপ্তম অধ্যায়

৭.০ পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৭.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় যাতে ১০০ জন উত্তরদাতার নিকট দশটি প্রশ্ন রাখা হয়। প্রথম প্রশ্নটি ছিল সার্বিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা এর জন্য দায়ী - ক) নিরক্ষরতা, খ) সার্বিক নৈতিক অবনতি, গ) দারিদ্র, ঘ) সর্বস্তরে দুর্নীতি, ঙ) অন্য কিছু। উত্তরদাতাগণ একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর বা কারণ উল্লেখ করেছেন। উত্তরদাতাগণ সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী লোক, পুরুষ ও মহিলা উভয় শ্রেণীর, উত্তরদাতারা সকলেই শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন নাগরিক। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 'ক' নিরক্ষরতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ৩৩ জন 'খ' সার্বিক নৈতিক অবনতিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ২৮ জন গ) দারিদ্রকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ১৩ জন ঘ) সর্বস্তরে দুর্নীতিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ৪৪ জন। এতে দেখা যায় সমাজের আর্থিক উন্নয়নে সর্বস্তরে দুর্নীতি এক বিরাট অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বস্তুত এ জনমত বিরাজিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য।

৭.২ এ উপমহাদেশে বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি বিদ্যমান ছিল। কোন আমল বা যুগই এ ব্যাধি হতে মুক্ত ছিল না। কোন সময়ে এ ব্যাধির প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটে তা নিরূপণ করার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি হয় - ক) মোঘল আমলে/নবাব আমলে খ) কোম্পানী আমল গ) ব্রিটিশ আমল ঘ) পাকিস্তান আমল ঙ) স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ আমল এ প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতাগণ উত্তর দিয়েছেন। ক - ৪ জন, খ - ৪, গ - ৩ জন, ঘ - ১৪ জন এবং ঙ - ৮১ জন। ক - গ তে

দুর্নীতির হার সমান বলে দেখা যায়। কিন্তু ঘ অর্থাৎ পাকিস্তান আমল এবং ঙ অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্যাপক হারে দুর্নীতি বিস্তার লাভ করে বলে সমীক্ষায় জনমতে প্রকাশ পায় যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য।

৭.৩ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কোন সময়ে দুর্নীতির প্রসার হয় সবচেয়ে বেশী উত্তরদাতাদের নিকট এ প্রশ্ন রাখা হয়। ক) সত্তর এর দশকে খ) আশির দশকে গ) আশির দশকের পর হতে ঘ) এ সময় নয় ঙ) অন্য কোন সময়ে। ক - তে উত্তর দেন ২৩ জন, খ - তে উত্তর দেন ৫১ জন, গ - তে উত্তর দেন ৩০ জন অর্থাৎ আশির দশকে দুর্নীতি সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। উত্তরদাতাদের উত্তর সারণী - ২ ব্যুরোর পরিসংখ্যান এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবতার নিরিখে এ উত্তর গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক।

৭.৪ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি সমাজের কোন স্তরে তা নিরূপণ করার জন্য উত্তরদাতাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয়। ক) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ) শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলে ঘ) নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে ঙ) অন্য কিছু। ক - অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি সবচেয়ে বেশী উত্তর দেন ৫৩ জন। খ - রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বেশী উত্তর দেন ২৮ জন, গ) শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলে দুর্নীতি বেশী উত্তর দেন ৪৫ জন। ঘ এবং ঙ তে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এতে দেখা যায় বাংলাদেশে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী মহলে দুর্নীতি সর্বাধিক। এর পরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং তৃতীয়ত রাজনৈতিক মহলে দুর্নীতি বিরাজমান বলে উত্তরদাতাগণ উত্তর দেন।

৭.৫ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির কারণ নিরূপণের জন্য প্রশ্ন রাখা হয়। প্রশ্নে ক) বেতনের স্বল্পতা খ) রাজনৈতিক চাপ গ) পারিবারিক চাপ ঘ) সামাজিক মর্যাদার প্রলোভন ঙ) অন্য কিছু কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। উত্তরদাতাগণ ক) বেতনের স্বল্পতাকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন ৮৩ জন, খ) রাজনৈতিক চাপ উল্লেখ করেন ১৫ জন গ), পারিবারিক চাপ উল্লেখ করেন ১১ জন ঘ) সামাজিক মর্যাদার প্রলোভন উল্লেখ করেন ২৫ জন ঙ) অন্য কিছু উল্লেখ করেন ৩ জন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একই উত্তরদাতা প্রশ্নের একাধিক কারণ চিহ্নিত বা উল্লেখ করেন। উত্তরদাতাগণ সরকারী কর্মচারীদের বেতনের স্বল্পতা যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে বলে তাদের জবাবে উল্লেখ করেন। এর সাথে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রলোভন সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জনে প্ররোচিত করে। কারণ দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি হয় না এবং সামাজিকভাবে নিন্দিত না হয়ে তারা বরং সমাজের প্রতিপত্তি ও বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ফলশ্রুতিতে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও এ ব্যাধি সংক্রমিত হয়ে পড়ছে।

৭.৬ সরকারী কর্মচারীদের কোন পর্যায়ে দুর্নীতি বেশী তা নিরূপণের জন্য উত্তরদাতাদের প্রশ্ন রাখা হলে ক) প্রথম শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ে খ) প্রথম শ্রেণীর মধ্যম পর্যায়ের গ) প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক পর্যায়ের ঘ) দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যায়ের ঙ) তৃতীয় শ্রেণী পর্যায়ের এবং চ) চতুর্থ শ্রেণী পর্যায়ের। উত্তরদাতাগণ উত্তর দেন ক-৫৫, খ-৪৫, গ-১৭, ঘ-১১, ঙ-৯ এবং চ-২ জন। এতে দেখা যায় যে ক,খ,গ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী উচ্চ, মধ্য এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বাধিক দুর্নীতি বিদ্যমান বলে উত্তরদাতাগণ মত প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে দুর্নীতি বিদ্যমান এ সম্পর্কে খুব স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা মতামত রাখেন। বাস্তবে আরো ব্যাপকভাবে সমীক্ষা চালানো হলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতেও দুর্নীতি বিদ্যমান তা প্রতিফলিত হতে পারে। তবে এ কথা সত্যি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী যে আকার ও প্রকার দুর্নীতি করে, তার প্রতিক্রিয়া সরকারী কর্মকর্তাদের উচ্চশ্রেণী পর্যায়ে যে দুর্নীতি হয় তার তুলনায় খুবই নগণ্য। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, উন্নয়ন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না।

৭.৭ দুর্নীতির সামাজিক, নৈতিক এবং আইনগত দিক রয়েছে। দুর্নীতি বলতে কি বুঝায় তা নিরূপণ ও নির্ধারণের জন্য উত্তরদাতাদের নিকট প্রশ্ন রাখা হয় - ক) স্বজন-প্রীতি খ) প্রিয়তোষণ গ) ক্ষমতার অপব্যবহার ঘ) ঘুষ/ আত্মসাৎ/জালিয়াতি ঙ) অন্য কিছু কিনা। উত্তরদাতাগণ জবাব দেন ক-১১ জন, খ-১ জন গ-৩৭ জন, ঘ-৮০ এবং ঙ-নাই। এতে দেখা যায় ঘ-ঘুষ/আত্মসাৎ/জালিয়াতিকেই সর্বাধিক সংখ্যক দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন দ্বিতীয় স্থানে আছে গ- অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার। বস্তুত স্বজন-প্রীতি ও প্রিয়তোষণ দুর্নীতির আওতাভুক্ত এবং এর ফলে সমাজে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। সম্পদের সুষম বন্টন ও ন্যায় বিচার বিপন্ন হয়।

৭.৮ সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের নিকট দুর্নীতির প্রসার ও বিস্তার এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয় ক) সামাজিক মূল্যবোধের অভাব খ) সুশিক্ষার অভাব গ) কর্মসংস্থানের অভাব ঘ) সরকারের আকার বা কলেবর বৃদ্ধি ঙ) দুর্নীতিবাজ লোকদের বিচার, শাস্তি অভাব - এর কোনটি। এতে উত্তর দেন - ক-৪১ জন, খ-১৩ জন, গ-১১ জন, ঘ-১০ জন, ঙ-৫০ জন। উত্তরদাতাগণ একাধিক কারণ চিহ্নিত করেন। সর্বাধিক সংখ্যক উত্তর দেন ঙ অর্থাৎ দুর্নীতিবাজ লোকদের বিচার/শাস্তির অভাব। দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক উত্তর দেন ক অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধের অভাব। তৃতীয় খ অর্থাৎ সুশিক্ষার অভাব, চতুর্থ অর্থাৎ গ কর্মসংস্থানের অভাব এবং পঞ্চম স্থানে ঘ অর্থাৎ সরকারের আকার বৃদ্ধি। বস্তুত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য সমাজে দুর্নীতি প্রসার ও বিস্তার এর কারণ সম্পর্কে যথাযথভাবে চিহ্নিত করেছে। দুর্নীতিবাজ লোকদের চিহ্নিত করে সঠিক বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা না গেলে দুর্নীতি নির্মূল না করা গেলেও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৭.৯ এ অধ্যায়ে দুর্নীতির ব্যাপকতার মাত্রাক্রমানুসারে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে বলা হলে দেখা যায় যে, ক্রমানুসারে প্রথমে এসেছে কর বিভাগ, পুলিশ বিভাগের নাম, আবার কখনো প্রশাসন বিভাগের নাম, কখনো বিদ্যুৎ বিভাগ, কখনো সচিবালয়, কখনো শিক্ষা বিভাগ, কখনো প্রকৌশল বিভাগ, কখনো খাদ্য বিভাগ, কখনো স্বাস্থ্য বিভাগ, কখনো কৃষি বিভাগ, কখনো ভূমি প্রশাসন, কখনো জরিপ, কখনো হাউজিং সেটেলমেন্ট, কখনো গ্যাস, কখনো ওয়াসা, কখনো রাজউক কখনো ত্রাণ, কখনো বন বিভাগ। এ পর্যায়ে বিচার বিভাগও বাদ যায়নি। কোন কোন উত্তরদাতা এ বিভাগকেও প্রথম স্থানে চিহ্নিত করেছেন। বিচার বিভাগ ও জেলা প্রশাসনে দুর্নীতির এ অবস্থান জনগণ চিহ্নিত করেছেন যা বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। বাদ গেছে পরিসংখ্যান বিভাগ এবং আবহাওয়া বিভাগের মতন দপ্তর যারা আর্থিক লেনদেন সম্পর্কযুক্ত নয়। এতে প্রতীয়মান হয় লাভ লোকসানের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি দপ্তরেই দুর্নীতি রয়েছে এবং সময়ে এর প্রাধান্য শীর্ষ পর্যায়ে উপনিত হয়।

৭.১০ উত্তরদাতাদের নিকট দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কি করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়। প্রশ্নে ক) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা খ) নৈতিক শিক্ষা প্রদান গ) সরকারের আকার সংকোচন ও ব্যয় হ্রাস ঘ) আয়বৃদ্ধি ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং ঙ) দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা এ প্রশ্ন রাখা হয়। উত্তরদাতাগণ ক-১৩ জন, খ-২৫ জন, গ-৫, ঘ-৩৭ এবং ঙ-৬৬ জন উত্তর দেন। এতে দেখা যায় যে, ঙ-তে সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা দুর্নীতিবাজদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের মাধ্যমে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা আয় বৃদ্ধি এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার কথা উল্লেখ করেন। চতুর্থ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং পঞ্চম পর্যায়ে সরকারের আকার সংকোচন ও ব্যয় হ্রাসের কথা বলেন ৫ জন উত্তরদাতা। বস্তুতপক্ষে দুর্নীতিবাজ লোকদের সামাজিকভাবে চিহ্নিত করে প্রতিরোধ ও নিন্দা জ্ঞাপন এবং আইনগতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে সমাজে দুর্নীতির প্রসার কমে আসবে এবং নিয়ন্ত্রিত থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অষ্টম অধ্যায়

৮.০ বিরাজিত বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা

৮.১ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে যে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে ডঃ ইউনুসের মতে তা কমপক্ষে এক লাখ কোটি টাকা। হিসাব মতে ফেরতযোগ্য ঋণের

পরিমাণ হবে ৬০,০০০ কোটি টাকা। মাথাপিছু ঋণ প্রায় ৫,০০০ টাকা, গড় মাথাপিছু আয় ২২৪ মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমাদের জাতীয় সম্পদ আর ঋণের অনুপাত হলো ৫২% অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ৫২% বিদেশীদের কাছে দায়বদ্ধ। বর্তমানে শিক্ষার হার ৩৭% এর নিচে, প্রায় ৮০% লোক অপুষ্টিতে ভোগে, ৫৫% লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এ দেশের গ্রামের প্রায় ৭০% লোক ভূমিহীন। গ্রামের ৫০% মহিলা মাত্র দৈনিক ১০০০ ক্যালরি খাবার পায় যেখানে দরকার ২৩০০ ক্যালোরি।^১

৮.২ স্বাধীনতার পর বৈদেশিক ঋণের বোঝা ছিল ৩৫০ কোটি টাকা আর বর্তমানে তা এসে দাড়িয়েছে ৬০,০০০ বা ৬৫,০০০ কোটিতে। এখন বছরের প্রায় ২০০০ কোটি টাকা সুদ ও আসল (debt service liability) হিসেবে পরিশোধ করতে হচ্ছে। রপ্তানী বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ যা রপ্তানী করে তার তিনগুণ আমদানী করে।

৮.৩ প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের টাকার অপচয়, অপব্যবহার আত্মসাৎ এর অভিযোগ রয়েছে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে, যার জন্য দায়ী প্রশাসনের অদক্ষতা ও দুর্নীতি। মহা হিসাব রক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মোট চুরি হয়েছে ৮০৯ কোটি টাকা, আত্মসাৎ হয়েছে ১০৫ কোটি টাকা, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিধি বহির্ভূত ব্যয় প্রায় ৩৩৬২ কোটি টাকা। এছাড়া মাত্র ৯টি মন্ত্রণালয়ে অপচয় হয়েছে প্রায় ২৫০৭ কোটি টাকা। মোট আদায় যোগ্য টাকা যা আদায় না করে এর বিনিময়ে নিজে লাভবান হওয়া যা অন্যকে লাভবান করার ঘটনা ঘটে। এরূপ অর্থের পরিমাণ ১১,০০০ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে শুধুমাত্র ব্যাংকিং খাতেই অনাদায়ী ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। বর্তমানে তা এসে দাড়িয়েছে ১১,৫০০ কোটি টাকায়। সরকারী সম্পদ বেহিসাবী খরচ করার প্রক্রিয়া চালু হয় পাকিস্তান সামরিক শাসনামলে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২-৬৯ সাল পর্যন্ত মৌলিক প্ৰগতত্ত্বের নামে ১০০০ টাকা অপচয় করা হয়, যার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। একই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে এরশাদ আমলে ১৯৮৫-৯০ পর্যন্ত ১০০০ কোটি টাকা উপজেলা পদ্ধতির নামে খোলা হাতে খরচ করা হয়। সরকারীভাবে দুর্নীতির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ বা মদদ দান বলা যেতে পারে। সরকার বা প্রশাসন যত্নে দুর্নীতি সমাজে নিম্নবর্ণিত সঙ্কটজনিত পরিস্থিতি নিয়ে আসেঃ

ক) আইনের ভয় থাকে না

খ) অন্যায় করে অপরাধ বোধ আসে না

গ) লোকেরা দুর্নীতিবাজদের নিন্দা করে না

ঘ) কালো টাকা দিয়ে সম্মান কেনা যায়

ঙ) সৎ লোকেরা অসৎ লোকদের ভয় পায়

- চ) অসৎ লোকদের দাপটে সৎ লোকেরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না
- ছ) অসৎ লোকদের পেছনে রাজনৈতিক ক্ষমতার সমর্থন থাকে
- জ) কালো টাকা দিয়ে বিচার ক্রয় করা যায়

৮.৪ বাংলাদেশ বর্তমানে বিরাজিত পরিস্থিতি এমন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থে কাজ করে। সমাজের স্বার্থে কাজ করার লোকের বড়ই আকাল। এ পরিবেশের জন্য সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীই দায়ী। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অভাবে বাংলাদেশে সামাজিক অবক্ষয় এমন এক পর্যায়ে থেকে এসেছে যে বর্তমানে সমাজে অনৈতিক বিষয়ও ব্যক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে যেমন -

- ক) কন্যার পিতা ম্যাজিস্ট্রেটের বদলে কাষ্টমস ইন্সপেক্টর জামাই হিসাবে পেতে চান।
- খ) শিক্ষকগণ তাদেরকেই যত্ন করে পড়ান যারা তাঁদের কাছে প্রাইভেট পড়ে।
- গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সারা বছর এনজিওদের টিকেটে বারবার বিদেশে সফর করেন বা কনসালটেন্সি করেন কিন্তু এর জন্য কারও অনুমতি নেন না।
- ঘ) আমলারা বেনামিতে কনসালটেন্সি করেন এবং অনেকের স্ত্রী পুত্র বা কন্যারা এনজিওতে মোটা টাকার বেতনে চাকুরী করেন।
- ঙ) প্রাইভেট ব্যাংক বলে পরিচিত টাকার খনি হতে বালতি ভর্তি টাকা পানির মত তুলে নিচ্ছেন যারা ব্যাংকের পরিবার ভিত্তিক পরিচালক মন্ডলী।
- চ) ব্যাংকের কোন কোন রক্ষক ম্যানেজার ও তার সহকর্মী ভূয়া একাউন্ট খুলে, কোন পার্টির সম্পূর্ণ টাকা ঐ একাউন্টে স্থানান্তর করে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছেন। প্রয়োজনে ধর-পাকড় করে মামলা রহিত করছেন বা সিভিল কোর্টে আশ্রয় নিচ্ছেন।
- ছ) মাদ্রাসার সুপার, মাদ্রাসার নামে বরাদ্দকৃত টিন বিক্রি করে ঐ টাকা আত্মসাৎ করছেন।
- জ) বড় বড় প্রকল্পে - দাতাদের সাথে বিদেশী সরবরাহকারীদের সাথে আঁতাত করে বহু সম্মানী ও শক্তিদর লোকেরা নিজেদের লাভের বিনিময়ে দেশের স্বার্থ বিক্রি করে দিচ্ছেন।

৮.৫ পূর্বে বর্ণিত অবস্থার সাথে বর্ণিত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টাকা কোর্টে - টাকা জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো অফিস কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় রাষ্ট্রপতি থেকে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ে ৯৫ জন এবং একই সময়ে রুজুকৃত মামলার নন গেজেটেড কর্মচারী, ব্যাংকের কর্মচারী, মেম্বর, চেয়ারম্যান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী লোক ২৭০ জন, সর্বমোট ৩৬৫ জন এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বর্ণিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আইন প্রয়োগ করা হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বলের প্রতি। দায়েরকৃত

মামলার মোট ৩৬৫ জন আসামীর মধ্যে ৯৫ জন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ লোক। বাকীরা সাধারণ ও দুর্বল মানুষ।^{১০}

৮.৬ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দায়েরকৃত মামলা তদন্ত শেষে বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কোর্টে সোপর্দ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে বিচার কার্য সমাপ্ত করা যায় না। বিচারাধীন মামলার একটা সিংহভাগ মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ ও অন্যান্য কারণে স্থগিত করা আছে। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে এ সকল অধিকাংশ মামলার আসামী সমাজের বিত্তবান প্রবাবশালী ব্যক্তি, উচ্চশ্রেণীর আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

নবম অধ্যায়

৯.০ উপসংহার

৯.১ বিশ্বের দেশে দেশে দুর্নীতি বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে এর প্রকোপ কম নয়। এ অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। পূর্ব হতে সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এ ব্যাধি বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান আমলে তা বেড়ে উঠে ধারাবাহিকভাবে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এর প্রসার ও বিস্তার ঘটে যা সমীক্ষার প্রশ্নের উত্তরদাতাদের জবাবে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত চিত্র জনমতের প্রতিফলন এবং বাস্তব অবস্থাও বটে। সরকারের সকল পর্যায়ে, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, অর্থলগ্নি সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীমহল, রাজনৈতিক মহল, সমাজ, ব্যক্তি, সমষ্টি সবকিছুই বাদ পড়েনি এ ব্যাধির ছোবল থেকে। শহর বা গ্রাম কোন স্থান বিশেষ রেহাই পায়নি এ ব্যাধির রাহুগ্রাস থেকে।

৯.২ প্রতিনিয়ত প্রচুর আলোচনা সমালোচনা হয় দুর্নীতি নামক ব্যাধি প্রসঙ্গের। ব্যক্তি ও সমষ্টি সকলেই এ প্রসঙ্গে সমালোচনায় মুখর। দৈনিক পত্র পত্রিকা, প্রচার ও সংবাদ মাধ্যম সকল স্তরেই এ প্রসঙ্গে সংবাদ বা তথ্য প্রকাশিত হয়। তবে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ বা প্রতিকারের কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।

৯.৩ সরকারী পর্যায়ে ১৯৫৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের সৃষ্ট দুর্নীতি দমন সংস্থা, বর্তমানে যা দুর্নীতিদমন ব্যুরো হিসেবে দুর্নীতি দমন কাজে নিয়োজিত আছে তার সম্পর্কেও জনমত সমীক্ষায় একই মতামতের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত দুর্নীতি দমন ব্যুরো একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা সমাজ ও পরিবেশ হতে কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত এ প্রতিষ্ঠানও দুর্নীতি নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাধি যে প্রতাপ এবং প্রকোপ নিয়ে মহামারী আকারে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে তাকে

১০। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় রোধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ভূমিকা, মোহাম্মদ শহীদুল আলম, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ঢাকা। ১লা এপ্রিল, ১৯৯৫

একই শক্তিতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল সংগঠনকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৯.৪ এ জন্য প্রয়োজন সকল স্তরে জনমত গড়ে তোলা। জনমত গড়ে তুলতে হলে জনগণকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার। শিক্ষা প্রসারে সরকারী কর্মসূচী রয়েছে। সরকারী কর্মসূচীর পাশাপাশি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকেও এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার প্রসার এর প্রসঙ্গে কথা আসতে পারে সমাজে বিদ্যমান দুর্নীতিতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই প্রধান। সমীক্ষায় প্রাপ্ত জরিপ মতামতে তাই দেখা যায়। শিক্ষার প্রসার এর সাথে নৈতিক মূল্যবোধের সংযোজন, কর্ম সংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এ সকল বিষয়ে সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এর সাথে নিশ্চিত করতে হবে সরকারের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

৯.৫ বিশ্বব্যাপী সকলেই আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। এ দেশের পত্র-পত্রিকাও পিছিয়ে নেই। সমাজের সচেতন লোক মাত্র শক্তিত। খোদ বিশ্ব ব্যাংক যেখানে এ জন্য চিন্তিত ও কঠোর মত পোষণ করেন, এমতাবস্থায় আমাদের আর সময় ক্ষেপণ করার কোন সুযোগ নেই। সরকার ও সমাজের সকল স্তরেই ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্নীতি নামক এ ব্যাধির সংক্রমণ ও বিস্তার রোধের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা, জনগণের ঐকান্তিক সহায়তা এবং আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ। এ নিশ্চিত করা গেলে বিচার ব্যবস্থা এবং বিচারক সক্ষম হবে বিচার কার্য সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সম্পাদনে। ফলশ্রুতিতে ফিরে আসবে জনমনে আস্থা, মানুষ বিবর্তবোধ করবে না অন্যায়কে ঘৃণা করতে এবং আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে। এর মাধ্যমে সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতি নামক দুষ্ট সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ করাই হলো আজকের সমাজ সচেতন সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, সমাজের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে জনমতে প্রতিফলিত।

- ক) সরকার ও জনগণের অঙ্গীকার
- খ) প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- গ) আইনের নিরপেক্ষতা প্রয়োগ
- ঘ) দুর্নীতি দমন আইনের সংস্কার ও ব্যুরোর কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণ বিধি প্রণয়ন
- ঙ) সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অনুশীলন
- চ) শিক্ষার প্রসার
- ছ) কর্ম সংস্থান
- জ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সরকারের ব্যয়হ্রাস
- ঝ) দ্রব্যমূল্যের সমানুপাতিকহারে বেতনভাতা নির্ধারণ।

পরিশিষ্ট-‘ক’

- ১। ১৯৫৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের (এ্যাক্ট নং - ২৬) আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ;
- ২। ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের (এ্যাক্ট নং -২) আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ;
- ৩। দণ্ডবিধির ১২০ বি, ১৬১ থেকে ১৬৯, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ২০১, ২১৭, ২১৮, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৭৯ থেকে ৩৮২, ৪০৩ থেকে ৪০৯, ৪১১, ৪১৪, ৪১৭ থেকে ৪২০, ৪৬৫ থেকে ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৭এ, ৪৮৯এ থেকে ৪৮৯ই এবং ৫১১ ধারার অপরাধসমূহ;
- ৪। ১৯৫৬ সনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ৫। ১৯৫৩ সনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য (মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং হোর্ডিং বিরোধী) আইনের দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ৬। ১৯৫২ সনের চোরাচালান প্রতিরোধ আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ৭। ১৯৪৮ সনের হোর্ডিং ও কালোবাজার বিরোধী আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ৮। ১৯৫০ সনের আমদানী ও রপ্তানী (নিয়ন্ত্রণ) আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ৯। ১৯৫০ সনের বাংলাদেশ (খাদ্য শস্যের চোরাচালন) আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ সমূহ;
- ১০। ১৯২৩ সনের অফিসিয়াল সিক্রেট আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ১১। ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ১৫৬ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধ;
- ১২। ১৯৫২ সনের পাসপোর্ট (অপরাধ) আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ১৩। ১৯৪৭ সনের বৈদেশিক মুদ্রা বিধি আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ১৪। ১৯৭০ সনের বাংলাদেশ পাসপোর্ট আদেশের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ;
- ১৫। উপরে ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত ক্রমিক বর্ণিত অপরাধসমূহের উদ্যোগ, যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্র;
- ১৬। ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ তফশিলভুক্ত অপরাধ বিশেষ ট্রাইবুনাল আদেশের ২নং আর্টিকেলের ৪নং ক্রমে বর্ণিত মারাত্মক অপরাধ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫); এবং
- ১৭। ১৯৪৮ সনের অতিধি নিয়ন্ত্রণ আদেশ।

গ্রন্থপঞ্জী

আলম, মোহাম্মদ শহীদুল, (১৯৯৫), বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয় রোধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ভূমিকা, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ঢাকা।

বিশ্ব ব্যাংক, ১লা জুলাই, (১৯৯৬), গভার্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৬), ভারত বর্ষের ইতিহাস, পশ্চিম বঙ্গরাজ্য পরিষদ, কলিকাতা।

মিরডাল, গুনার, (১৯৬৮), এলেন লেন, দি পেওউইন প্রেস, লন্ডন।

হাকিম, খান বাহাদুর আব্দুল (১৯৭৬), বাংলা বিশ্বকোষ-দ্বিতীয় খণ্ড, । নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা।